প্যারেন্টীং

বাচ্চাদের সাথে কথা বলা

Rehnuma Binte Anis

2011-06-15 14:42:33 +0600 +0600

13 MIN READ

বাচ্চারা খুব বুদ্ধিমান হয়। তাই তাদের সাথে বুদ্ধিদীপ্ত এবং যুক্তিগ্রাহ্য কথা না বললে ওরা সহজেই বুঝতে পারে ওদের নির্বোধ ভাবা হচ্ছে। তখন হয় ওরা বিরক্ত হয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে নতুবা যে ওদের নির্বোধ ভেবে কথা বল্ল তার প্রতি শ্রদ্ধা। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা ওদের যে শিক্ষা দিতে আগ্রহী সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ্ হয়। তাই আমাদের উচিত তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলা যেন ওরা বুঝতে পারে আমরা তাদের নিজেদের সমকক্ষ ভাবছি এবং তাদের মতামতের মূল্যায়ন করছি। ওদের মোটামোটি মূল ব্যাপারটা সততা এবং আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে দিলে ওরা আর খুব বেশী জানতে চায়না। বাকীটা ওরা নিজেরাই বুঝে নেয়। কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা বাচ্চাদের সাথে সরাসরি কথা না বলে ধামাচাপা দিয়ে বা দায়সারা গোছের কথা বলে বা অনেক ক্ষেত্রে অন্য কথা বলে কথা ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে পরিস্থিতি জটিল করে তুলি কারণ তখন ওদের আগ্রহ আরো বেড়ে যায় এবং ওরা ভুল জায়গায় তথ্য অনুসন্ধান করতে যায়।

আমরা মূলত বাচ্চাদের সাথে যেসব বিষয়ে কথা বলি তাকে কয়েকটা ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন- পারিবারিক সম্পর্ক, পরিচিতজনদের সাথে ব্যবহার, অপরিতচিতজনদের সাথে সাবধানতা, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, জীবনদর্শন, দায়িত্বসচেতনতা, চাহিদা, নিয়মনীতি এবং শাসন।

প্রথমত বাচ্চাদের কাছে পারিবারিক সম্পর্কগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন এবং এই কাঠামোতে তাদের অবস্থান তাদের কাছে পরিস্কার করে দেয়া দরকার। যেমন আমার যখন ছোটভাই হোল। একদিন সকালবেলা উঠে শুনি আমার সাড়ে ছয় বছরের রাজত্ব খতম। দাদু বলল, “তুমি তো কালো, দেখতেও সুন্দর না, এখন তোমার ফুটফুটে ফর্সা একটা ভাই হয়েছে, তোমাকে এখন আর আব্বু আম্মু ভালোবাসবে না, আমরা সবাই নতুন বাচ্চাটাকে আদর করব”। বাবামা’র বয়স এবং অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। ওরাও ব্যাপারটাকে পাত্তা দিলনা। তদুপরি আমাকে নানীর সাথে আলাদা রুমে পাঠিয়ে দেয়া হোল। অথচ আমিই নামাজ পড়ে দোয়া করেছিলাম যেন আমার একটা ছোটভাই হয়। সেই আমার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা! সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার শিশুমনে প্রচন্ড আঘাত করল। ব্যাস, আর পায় কে? আহমদ বেচারা নেহাৎ ভদ্র ভালোমানুষটি বলে আমার সমস্ত অত্যাচার বছরের পর বছর মুখ বুজে সহ্য করে গিয়েছে। আজ এত বছর পর ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব মোহাম্মদের চেয়েও বেশী যদিও মোহাম্মদ আমার বারো বছরের ছোট হওয়ায় ওর প্রতি অনেকক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব পালন করা হয়েছে আমার। কিন্তু আহমদের প্রতি আমার এই অত্যাচার একটু সচেতন হলেই এড়ানো যেত।

আমি যখন বুঝতে পারলাম যে রাদিয়ার ঠিক একই ব্যবধানে ভাই বা বোন হতে যাচ্ছে সাথে সাথে আমি ওকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিলাম। ওকে বললাম, “সাকিবের একটা বোন আছে বলে ও হিসানের সাথে খেলতে পারে, ওরা দু’জন একসাথে গল্প করতে পারে। কিন্তু ওরা যখন চলে যায় তখন তো তোমার আর খেলার বা গল্প করার কেউ থাকেনা। এখন যদি আমাদের বাসায় একটা বেবী আসে তাহলে তুমি ওর সাথে খেলতে পারবে, গল্প করতে পারবে- এটা কেমন হয়?” ও বলল, “লাগবেনা, সাকিব হিসান আসলে ওদের সাথে খেলব আর নাহলে তোমার সাথেই খেলব”।

ক’দিন পর ওকে বললাম, “ধর, আল্লাহ যদি একটা বেবী পাঠিয়ে দেন তাহলে কি করব?” ও জিজ্ঞেস করল, “আল্লাহ যদি দেন তাহলে তো না বলা যাবেনা, না?” আমি বললাম, “না”। ও তখন বলল, “আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে বারান্দার পাশে যে সুপারী গাছটা আছে ওখানে রেখে দিও। তাহলে বারান্দা দিয়ে আমি ওকে খাবার দিতে পারব”। ওকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিয়ে আমি ওকে নিজের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার ব্যবস্থা করে দিলাম।

কিছুদিন পর ওকে বললাম, “বৃষ্টি পড়লে তো বেবীটা ভিজে যাবে তখন কি করবে?” রাদিয়া চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিল যে

বেবীটাকে সুপারী গাছ থেকে ট্রান্সফার করে বারান্দায় রাখলে খুব বেশী সমস্যা নেই। এ'সময় আমার প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। ও জিজ্ঞেস করলে বুঝিয়ে বললাম, "বেবীটাকে আল্লাহ বলেছেন বড় হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন আম্মুর ভিতরে থাকতে। কিন্তু বেবীটা ভীষণ দুষ্ট। শুধু লাফালাফি করে আর আম্মু নিশ্বাস নিতে পারিনা"। সে সাথে সাথে বড়বোনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গেল, "অ্যাই বেবী, এত দুষ্টুমী করবেনা। শোন, আমি তোমাকে গান শোনাই, তুমি ঘুমাও। খবরদার আম্মুকে জ্বালাবেনা!"

এভাবে আস্তে আস্তে সে একজন অদেখা অচেনা আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কগড়ে তুলতে লাগল, তার আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল যে ওকে সম্মান করবে, ওর কথা শুনবে, ওর সাথে খেলবে, গল্প করবে। রিহাম আসার কিছুদিন আগে সে ঘোষনা দিল, "বেবীকে ঘরের ভেতরে রাখা যাবে যদি বেবী আব্বুর সাথে ঘুমায়। আমি তোমার পাশেই ঘুমাব"। এই শর্তেরিহামকে ঘরে আনা হোল।

ঘরে আনার পর আম্মা একটু দাদীসুলভ হা-হুতাশ শুরু করতে চেয়েছিলেন, "আহা! রাদিয়ার তো আর আদর নাই!" সেই প্রথম আমি আম্মাকে কড়া করে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, "আম্মা, এই বাচ্চা নিয়ে আমি কি কষ্ট করেছি আপনি দেখেছেন। দুইমাস বয়সের বাচ্চা নিয়ে আমি চাকরী করতে গিয়েছি। বুয়া ছিলনা, দিনরাত বাচ্চা নিয়ে চাকরী করে ঘরে এসেও বাচ্চা নিয়েই থাকতাম। আর আপনি যদি আজকে ওকে বুঝাতে আসেন যে ওকে ওর মা ভালোবাসেনা, আপনার সাথে আমার বিশাল সমস্যা হয়ে যাবে। আমি যেন কাউকে রাদিয়ার সাথে এ'ধরণের কথা বলতে না শুনি"। রাদিয়াকে বুঝিয়ে বললাম, "এটা তোমার বেবী, সুতরাং ওকে দেখাশোনা, শাসন করার দায়িত্ব তোমার"। সেও তখন খুশী হয়ে ভাইকে আপন করে নিল। এটা ছিল আমার এ'যাবৎকালের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেহেতু আমি চাইনি আমার মেয়ে সেরকম অসহায় বোধ করুক যা আমাকে আমার ভাইকে বন্ধুভাবার পরিবর্তেশত্রু ভাবতে শিখিয়েছিল।

আমি যেহেতু চাকরী করতাম, আমি জানতাম আমার পক্ষে আমার কোন সন্তানকেই সার্বক্ষণিক চোখে চোখে রাখা সম্ভব হবেনা। তাই ওদের ছোটবেলা থেকেই আমি বাগানে নিয়ে যেতাম। দেখাতাম মানুষের নানামুখী আচরণ। কেউ কেউ সুন্দর ফুল দেখলে প্রশংসাসূচক কিছু বলে চলে যান, কেউ একটু গন্ধ শুঁকে দেখেন, কেউ একটু ছুঁয়ে দেখেন, কেউ ফুলটাকে গাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলেন, আর কেউ কেউ নির্দয়ভাবে ফুলটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আনন্দ উপভোগ করেন। আমি তাদের শেখালাম কেউ তাদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসবে, কেউ আদর করবে কিন্তু তাতে স্বার্থের গন্ধ থাকবে, কেউ তাদের ভালোবাসবেনা আর কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইবে। সুতরাং তাদের মেনে নিতে হবে যে পৃথিবীতে সবাই ভালো হয়না, সবাই খারাপও হয়না। কিন্তু যতদিন জানা না যায় কে কেমন ততদিন নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ইনোসেন্স খুব ভালো জিনিস, কিন্তু এই ইনোসেন্স যদি কাউকে সহজ শিকারে পরিণত করে তাহলে তার কোন মূল্য নেই। একটা কার্টুনে ভারী মূল্যবান কথা শুনেছিলাম, পরে Platoon ছবিটিতে একই কথার পুণরাবৃত্তি শুনেছিলাম, "The first victim of war is innocence". আপনি ততদিনই নিষ্পাপ হওয়া পোষাতে পারেন যতদিন এটা আপনার নিরাপত্তার পরিপন্থি না হয়। আজকের যুগে শিশুদের ভুলিয়ে রেখে নিরাপদ রাখা আর সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের নিজেদেরই সচেতন করে তুলতে হবে। এক বান্ধবী বলেছিলেন ওনার মা ওনাকে ছোটবেলা থেকেই এই ধারণা দিয়ে বড় করেছেন যে শ্বাশুড়ীরা মায়ের মতই বৌদের আপন করে নেয়, বৌ আসার সাথে সাথে নিজের আঁচল থেকে চাবি খুলে বৌকে তুলে দেয়। তাই তিনি যখন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দেখলেন যে শ্বাশুড়ী মারমুখী তিনি কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না যে কি হোল এবং আদৌ সংসার করবেন কি'না ভেবেই তিনি অনেকখানি সময় ব্যায় করেছেন যা হয়ত আরো ফলপ্রসুভাবে কাজে লাগানো যেত। ছেলেমেয়েদের বোঝানো উচিত যে ভালো আত্মীয়স্বজন পাওয়া গেলে ভালো নতুবা যে যেমন তাকে সেভাবেই মেনে নিতে হবে। তাঁরা আমাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করুন বা না করুন বা যেমন আচরণই করুন, আমরা নিজেদের আচরণ এবং কাজগুলোই মূল্যায়ন করে নির্ণয় করার চেষ্টা করব যে আমরা কতটুকুভালো বা খারাপ। তাহলে আর কারো অন্যায় আমাদের মানবসত্ত্বা থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবেনা।

সময় পেলেই আমাদের সন্তানদের সাথে বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক কথাবার্তা বলা উচিত যেন তারা চিন্তার খোরাক পায় এবং আজেবাজে বিষয় বা সময় নষ্ট করার মত ব্যাপারগুলো থেকে তাদের বিরত রাখা যায়। এই আলোচনার ফাঁকেফাঁকে তাদের

বয়ঃসন্ধিক্ষণে যেসব পরিবর্তন আসবে তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা উচিত যেন তারা ঘাবড়ে না যায়, যেন তারা বুঝতে পারে কেন যেই ছেলে বা মেয়েটির সাথে কাল পর্যন্ত খেলা দোষণীয় ছিলোনা তার পাশে বসা যাবেনা বা তার সাথে কথাবার্তায় সংযত হতে হবে, তারা যখন পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা শুরু করবে তখন সে যেন বাবামায়ের সাথে এ'ব্যাপারে সরাসরি কথা বলতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নেয়ার সুযোগ পায় এই পথ খোলা রাখা খুব জরুরী। কারণ আমি প্রায়ই ছেলেমেয়েদের দেখেছি এসব ব্যাপারে বন্ধুবান্ধবের সাথে আলাপ পরামর্শ করতে, বলাইবাহুল্য এই বন্ধুর জানার বা ভাবার পরিধি বাবামায়ের সমকক্ষ নয় সুতরাং আমার সন্তান ভুলপথে পরিচালিত হতে পারে যদি না আমি তার সাথে এ'ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলি, তাকে বোঝাই এই আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয় তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সঠিক সময় এবং সঠিক মানুষটিকে না পাওয়া পর্যন্ত।

আমার বিয়ের পর আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে আম্মা প্রতিদিন ফজরের সময় এতবড় ছেলেকে নামাজ পড়ার জন্য ডাকতে আসেন, যে ছেলেকে উনি নিজেই আলিম বানিয়েছেন! তার কিছুদিন পর শুরু হোল জেরা, আমি প্রতি ওয়াক্তে নামাজ পড়ি কি'না, ওনার ছেলে কোন কোন সময় ফাঁকি দেন। উনি এমনকি পুত্র এবং পুত্রবধুর সহকর্মীদের ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন আমরা কর্মস্থলে ঠিকভাবে নামাজ পড়ি কি'না। আমার মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করত, "আম্মা, আমরা কি নামাজ আপনার জন্য পড়ি না আল্লাহর জন্য? আপনাকে ফাঁকি দেয়া কোন ব্যাপার না যেহেতু আমরা ছ'টায় বের হই রাতে অনেক সময় বারোটা সাড়ে বারোটায় ফিরি। কিন্তু নামাজ যার জন্য তাঁকে তো ফাঁকি দেয়ার কোন জায়গা নেই। তাহলে আপনি এত প্যারানয়েড হচ্ছেন কেন?" কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি।

পক্ষান্তরে আমি আমার সন্তানদের বুঝিয়ে দিয়েছি ওদের কাজের দায়িত্ব ওদের, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতাও ওদের। ফলাফল হোল, মাঝেমাঝে ওয়াক্তের কথা মনে করিয়ে দিতে হয় বটে (যেহেতু ক্যানাডায় আজান দেয়না) তবে রাদিয়া মোটামুটি নিজ দায়িত্বে নামাজ পড়ে। পর্দা করার সিদ্ধান্তও সে নিজেই নিয়েছিল যদিও আমি ওকে বলেছিলাম সে চাইলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু শুরু করলে আর ছাড়তে পারবেনা যেহেতু এটা আল্লাহর নির্দেশ মানার ব্যাপার। সে আটবছর বয়সেই নিজ দায়িত্বে পর্দা শুরু করে। ওদের ছোটবেলা থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছি কোন ব্যাপারগুলো permissible এবং কোনগুলো নিষিদ্ধ, কোন কাজের কি ফলাফল। প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছি রাদিয়া তাঁদের বাচ্চাদের বোঝায় কি করা উচিত এবং কোনটা না করা উচিত আর রিহাম তো আমার সামনেই সবার ওপর পন্ডিতি করে! ওরা অন্যায় করলে আমি ওদের ডেকে বুঝিয়ে দেই কেন তাদের বকা বা শাস্তি দেয়া হোল। কারণ আমি তাদের মারলে কোন কাজ হবেনা যদি ওরা না বোঝে ওরা ভুলটা কোথায় করল। বোঝানোর পর আমি ওদেরই জিজ্ঞেস করি ওরা শাস্তিটা সঠিক মনে করে কি'না। এতে করে তারা নিজেরদের কাজের দায়দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে সচেতন হয়।

আমি বাচ্চাদের বাসার সব কাজে জড়িত করার চেষ্টা করি যেন ওরা অনুভব করে এটা ওদের বাসা এবং এখানে সবার প্রতি এবং সবকিছুর প্রতি ওদের দায়িত্ব রয়েছে। দায়িত্ব ছাড়া leadership qualities গড়ে তোলা কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমার বাবা বলত প্রত্যেক ব্যক্তির, সে হোক ছেলে বা মেয়ে, সবধরণের কাজ করার অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। আমার এস এস সি পরীক্ষার পর তিনমাসের ছুটিতে বাবা আমাকে রান্না আর কম্পিউটার রপ্ত করার জন্য বসিয়ে দিল। বাংলাদেশে এসে ঘরের renovation চলাকালীন সময় বাবা এবং মিস্ত্রীদের সাথে থেকে প্ল্যানিং, কন্সট্রাকশনের কাজ, ফার্নিচার বানানোর কাজ, ঘরবাড়ী এবং কাঠের জিনিস রঙ করা, একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা- এসব ব্যাপারে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা করতে গিয়ে শেখা হয়েছে অনেক কিছু যা পরে কাজে লেগেছে। তাই আমিও আমার মেয়েকে সব কাজ করতে দেই যেন আমাকে ফ্যাশনমাফিক বলতে না হয়, "আমার বাচ্চারা তো কিছু পারেনা!" পারবেনা কেন? প্রথমে ভুল করবে, কিছু জিনিস নষ্ট করবে, খুব বেশী সুন্দর হয়ত হবেনা- তারপর একসময় ঠিকই পারবে। কিন্তু পারেনা পারেনা করে করতে না দিলে তো সে কখনোই শিখবেনা! তাছাড়া সবাই মিলে কাজ করতে করতেই তো সে শিখবে বাবামায়ের প্রতি সহানুভূতি, ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব, পারিবারিক মায়ামমতা এবং সবাই মিলে কিছু শেয়ার করার আনন্দ!

আজকাল এটা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে যে বাবামা মনে করেন বাচ্চাদের বাসায় কোন দায়িত্ব দেয়া মানে তাদের প্রতি

অবিচার করা। তাঁরা সবাইকে এত বেশী স্বাধীনতা দেন যে ভাইবোন পর্যন্ত একজন আরেকজনের সাথে কিছু ভাগাভাগি করতে রাজী হয়না, পরস্পরের প্রতি কোন দায়িত্ব বা সহানুভূতি অনুভব করার প্রয়োজন মনে করেনা। কিন্তু বাচ্চাদের সাথে কথা বলার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল কেনাকাটার ক্ষেত্রে সংযম। আজকাল দেখা যায় আমরা বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই দেই যেন "চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য থাকিবে"। কিন্তু একটা বাচ্চা কিছু চাইলে তার সাথে আলাপ করা দরকার সে এটা কেন চায়, এটা দিয়ে সে কি করবে, এর উপকারীতা ও অপকারিতাগুলো কি কি, জিনিসটি আদৌ তার প্রয়োজন আছে কি'না এবং এই টাকায় সে আর কি করতে পারে। এতে করে ওরা স্বার্থপর হবার পরিবর্তে needs এবং wants এর মধ্যে তফাত করতে শিখবে, অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের ওপর অগ্রাধিকার দিতে শিখবে। সর্বোপরি আমি তাদের মৃত্যু সম্পর্কেবলি যেন তারা বুঝতে পারে যে এই জীবনের মূল্য কেবল পরবর্তী জীবনের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্যই, সুতরাং এখানে সব পেয়ে যেতে হবে বা না পেলে হতাশ হতে হবে এই ধারণা তাদের স্পর্শ করেনা।

তবে কথা বলার সবচেয়ে বড় দিক হোল শোনা। আমাদের সন্তানেরা কি বলতে চায়, কি জানতে চায়, তাদের মনে কি প্রশ্ন তা আমাদের শুনতে হবে, জানতে হবে এবং যে শিশুটির স্বভাব যেমন সেভাবেই তার সাথে কথা বলতে হবে। যেমন বাবা আমাকে ডাকত "রেহনুমা বিনত ট্যারা"। আমাকে সুন্দর করে বললে আমি তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু কেউ আমার দিকে একটু বাঁকা করে তাকালো তো সব শেষ। আমার এই স্বভাব না বোঝার কারণে মা'র সাথে আমার অপূরণীয় দুরত্বের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আমি আমার দুই সন্তানের মধ্যেই দেখি রাদিয়া ওর বাবা আর বড়মামার মত নিয়ম মেনে চলা, অনুগত, ভালো মানুষ। কিন্তু রিহাম আমার মতই উচ্ছৃংখল, ট্যারা। সুতরাং রাদিয়াকে বোঝানো অনেক সহজ ওর কাছে আমাদের আশা-আকাংখা কি। কিন্তু রিহামকে পাম্প দিয়ে বলতে হয়, "যদি তুমি অমুক কাজটা কর তাহলে তোমাকে আম্মু স্পেশাল আদর করব আর যদি তমুক কাজটা কর তাহলে আম্মু আর তোমার সাথে কথা বলবনা"।

সুতরাং বাচ্চাদের সাথে কথা বলার জন্য সময় ব্যায় করতে হবে, আগে থেকে স্ক্রিপ্ট তৈরী করে বসতে হবে যেন একটা শব্দও এদিক ওদিক না হয়, যেন ওদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত থাকে আর প্রস্তুত না থাকলে যেন আমরা সৎসাহস নিয়ে বলতে পারি, "আমি পরে জেনে তোমাকে জানাব", ওরা যেন অবহেলিত বোধ না করে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই কথাবার্তার মাধ্যমে যেন ওরা অনুভব করে যে ওরা ব্যাপারগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারছে এবং ওদের বাবামা ওদের ভালোবাসে বলেই এই কথাগুলো ওদের বলা হচ্ছে।